দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

সাজ্জাদ কাদির

উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ : সফল নাকি ব্যর্থ

এই মুহূর্তে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা ৮৩টি। আর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৬৫টি। এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোয় প্রায় পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি। কয়েকটি কারণকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যেমন– ১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে উচ্চশিক্ষার বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। ২. দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদা পূরণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, সরকারের পক্ষে ওই সময় তা জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ৩. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন স্বল্পতার কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়া রোধ করা। এসব দিক বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণে সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ আইনত উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯৮-এ সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়। আইনটি পাস হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রেখে ভালোই চলছিল। এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুরুর দিকের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই যথাযথ শিক্ষার মান ধরে রাখতে পেরেছে। শীর্ষস্থানীয় এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার কয়েকটিতে নর্থ আমেরিকান ডিগ্রি ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না। এসব শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। এ ছাড়া আরও নানান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যা অবদান তা শুরুর দিকের এই ৮-১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অনুরূপভাবে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোও একই কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাতেগোনা অল্প কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ যথাযথ মান বজায় রেখে মেডিক্যাল শিক্ষা দিচ্ছে। যদিও আমি মেডিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র নই তার পরও আমি নিজে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের কমপক্ষে দুটি পুরনো বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সেখানকার অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতিসহ সামগ্রিক পরিবেশ সাদা চোখে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু অবশিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোর কী অবস্থা?

একটা সময় এসে বেসরকারি খাতের এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোর দিকে নজর পড়ে একশ্রেণির শিক্ষা ব্যবসায়ীর। শিক্ষা বিতরণের মহতী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। যার কারণে কোনোরকম সক্ষমতা ছাড়াই ঢাকা শহরের অলিগলিতে এমনকি ঢাকার বাইরের অনেক শহরেও স্রোতের মতো হু-হু করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিক্যাল কলেজ নাকি এখন এক বিরাট লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে মালিক শব্দটি। এই মালিকরা নানাভাবে তদবির করে এক একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন নিয়ে মালিক বনে গেছেন। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই মালিকদের আবার আলাদা অ্যাসোসিয়েশনও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের আবার যেহেতু মালিক হওয়া যায় সেহেতু মালিকরা নিশ্চয়ই

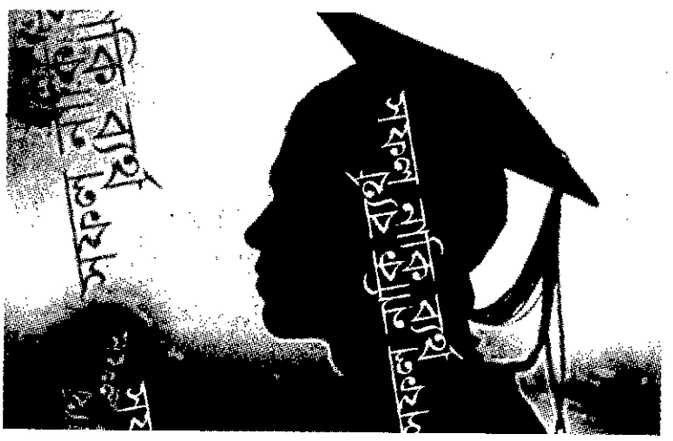

সরকারের নীতিমালার মধ্যে থেকেই এগুলো পরিচালনা করবেন এটিই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে এর উল্টো। আইন না মানা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভাগ খুলেছে কিন্তু ব্যবহারিক ক্লাস করার জন্য কোনো উপকরণ নেই। নেই পর্যাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও বিব্রত হতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা টিউশন ফি ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যাচ্ছে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট আসনের ৬ শতাংশ দরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে ভর্তি করানোর সুবিধা দিতে হবে। এর মধ্যে ৩ শতাংশ থাকবে দরিদ্র পরিবারের ও বাকি ৩ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান। কিন্তু এগুলো মানছে না সব বিশ্ববিদ্যালয়। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই যোগ্য ও সিনিয়র শিক্ষক। কখনো শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন না এমন কর্মকর্তাও অবসরে গিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে যান, ক্লাস নেন। কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন শিক্ষকদের এক একটা ট্রেনিং সেন্টার।

কোনোরকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে মার্কেট, আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবনের ভাড়া করা ছোট ছোট ফ্ল্যাটে। বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিত আউটার ক্যাম্পাসও চালায় তারা। শিক্ষক নিয়োগ, পাঠদান, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র মূল্যায়ন থেকে শুরু করে সব বিষয়ে চলছে চরম নৈরাজ্য। কার্যত এসব প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষার নামে সার্টিফিকেট ইন্ডাস্ট্রি।

কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেয়ে আগ-পিছ কিছু না ভেবেই শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্নে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে শুরুর দিকে শুধু ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা, যারা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছিল সেই শ্রেণির একটি অংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। কিন্তু এখন শুধু ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই নয়; মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কৃষক বাবার ফসল বিক্রি করা কষ্টার্জিত অর্থেও অনেকের সন্তান এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই– ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শিক্ষিত হবে। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষিত হচ্ছে নাকি সার্টিফিকেট কিনছে? বাস্তব জীবনে এই ক্রয় করা সার্টিফিকেট কী কাজে লাগছে তা ভুক্তভোগীমাত্রই বলতে পারবে।

অন্যদিকে দেশে অপরিকল্পিতভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের আগে এটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও কতসংখ্যক দক্ষ জনবল প্রয়োজন হবে তা আগাম চিন্তা না করে খেয়ালখুশিমাফিক খোলা হয়েছে। প্রচলিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নীতিমালা অনুসারে ৫০ আসনের মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে হলে কমপক্ষে দুই বছর আগে থেকে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল চালু থাকতে হবে। হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ বেডে রোগী থাকতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত হতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, অধিকাংশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ কি একটি মার্কেটের ওপর কিংবা একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছোট্ট রুমে ক্লাস-পরীক্ষা দেওয়া? বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ কি মার্কেটের ঘিঞ্জি পরিবেশে আড্ডা দেওয়া? বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ কি দশ ফুট বাই দশ ফুট ছোট্ট ক্যাফেতে চা-কফি খাওয়া? না মোটেই সেটি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। যেখানে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার দ্বার অবারিত। ছাত্র-শিক্ষকের অবারিত জ্ঞান বিনিময়ের জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী ৫-৬ বছরে শিক্ষা-গবেষণায় সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি হাঁটাচলা, আচার-আচরণ, রুচিবোধ ইত্যাদি অর্জন করে একজন বিশ্ব মানুষ হয়ে বের হবেন সেটিই কাম্য। আজকে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় ছোট হতে হতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের চেয়েও ছোট ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছে। কোচিং সেন্টার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি মোটেই এত ছোট নয়। আজকের এই দুর্গতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্ম হয়নি।

অন্যদিকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ডাক্তার তৈরি করছে নাকি অন্য কিছু সে বিষয়ে পর্যবেক্ষক মহল সন্দিহান। কারণ ডাক্তার তৈরির জন্য যে অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ, হাসপাতাল প্রয়োজন তার কিছুই নেই বেশিরভাগ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারিবিদ্যা একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা। বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবতার সংমিশ্রণে অর্জন না করলে ভবিষ্যতে এই ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসাও করতে পারবেন না। নামে ডাক্তার কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্য কিছু করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে খুব সহজে ঢুকে যেতে পারি। কিন্তু প্রক্রিয়াটির মধ্যে যে অনেক নেতিবাচক দিক থাকতে পারে সেটি চিন্তা করি না। এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ ধারণার মধ্যেও অনেক নেতিবাচক দিক আছে, যেগুলো আজকে প্রশ্নের সম্মুখীন। আজ মাত্র দুই দশক পর এসেই ভাবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ সফল নাকি ব্যর্থ। আজকে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবদান রাখছে তার চেয়ে বোঝার পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে বেশি। কাজেই সময় এসেছে এখনই নিয়ন্ত্রণের। নইলে ব্যাঙের ছাতার মতো এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ এক সময় সমাজের বিষফোঁড়ায় পরিণত হবে।

❑ **সাজ্জাদ কাদির,** সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমকর্মী
sazzadkadir71@gmail.com